পুকুরে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা

আরণ্যক ফাউন্ডেশন

পুকুরে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু সহিষ্ণু অংশগ্রহণমূলক বনায়ন প্রকল্প: বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম

আরণ্যক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

১ মাছ চাষের গুরুত্ব
২ মাছ চাষে আবশ্যকীয় শর্ত
৩ পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: পুকুর শুকানো ও মেরামত
৪ পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: রাক্ষুসে মাছ অপসারণ
৫ পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: সূর্যালোক প্রবেশ, দূষণ রোধ ও এসিড-ক্ষার নিয়ন্ত্রণ
৬ পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: সার প্রয়োগ
৭ পোনা পরিবহন ও মজুদের জন্য পোনা নির্বাচন
৮ পোনা মজুদ পূর্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও খাপ খাওয়ানো
৯ মজুদ পরবর্তী খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পানি পরীক্ষা
১০ মজুদ পরবর্তী জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ
১১ মজুদ পরবর্তী সম্পুরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা
১২ মাছের নমুনায়ন
১৩ সাপ্তাহিক ও মাসিক কাজ
১৪ মাছ আহরণ ও বাজার জাতকরণ
১৫ মাছের সাধারণ রোগবালাই: মাছের ক্ষত রোগ ও পাখনা/ লেজপচা রোগ
১৬ মাছের সাধারণ রোগবালাই: মাছের উকুন, পেট ফোলা ও অপুষ্টিজনিত রোগ

মাছ চাষের গুরুত্ব

মাছ চাষের গুরুত্বসমূহ :

পারিবারিক পুষ্টি: প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মাছ থেকে প্রাপ্ত আমিষ সর্বোত্তম। দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই জাতীয় আমিষ হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির ঝুঁকি কমায়। সুতরাং পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ হতে পারে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি: মাছ চাষের মাধ্যমে পরিবারের নারী ও পুরুষ সদস্যদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধি পায়। জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং বাড়তি আয় থেকে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা সমস্যার সমাধান হয়।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: পরিত্যক্ত পুকুর মশা, মাছি, কীট পতঙ্গ ও ক্ষতিকর প্রাণীর উপযুক্ত আবাসস্থল। বাড়ির আশেপাশে এ জাতীয় পুকুর থাকলে সহজেই রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। পুকুরে মাছ চাষ করলে রোগ জীবাণু, মশা-মাছির উপদ্রব কম হবে। অন্য দিকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে (যেমন- রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট পদার্থ) পরিবার আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

মাছ চাষে আবশ্যকীয় শর্ত

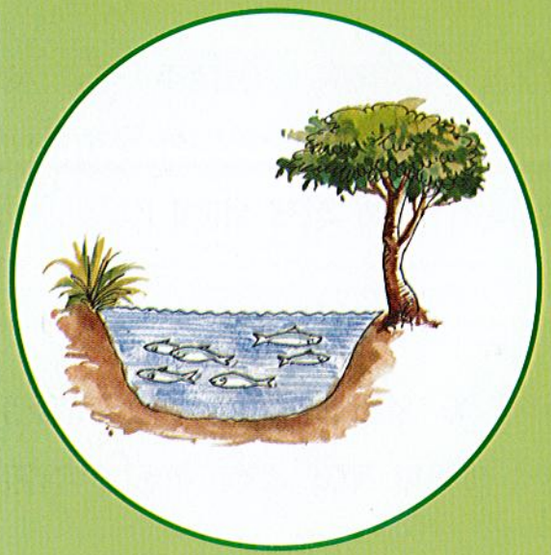

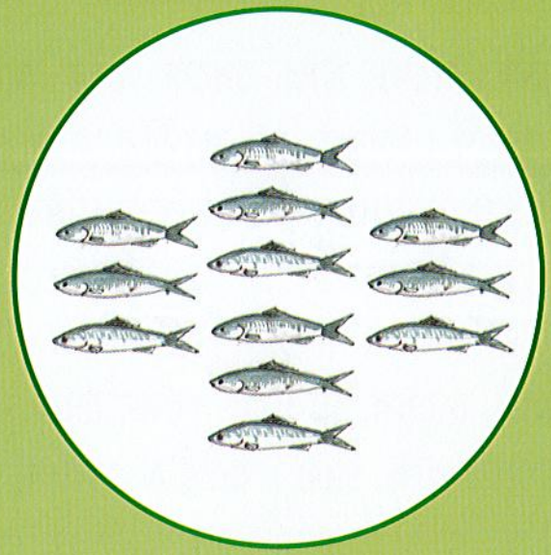

অজৈব সার

রেডি ফিড

চুন

ঔষধ

মাছ চাষে কি কি প্রয়োজন?

পুকুরঃ মৌসুমি (বছরে ৪-৫ মাস পানি থাকে) অথবা বারমেসে পুকুর। রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকারক গ্যাস মুক্ত, পরিপাটি, পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করে, পানিতে ভাসমান ও নিমজ্জিত মূলবেষ্টিত আগাছা মুক্ত এবং অনুকূল পি এইচ (pH) আছে এমন।

উন্নত পোনাঃ ভালো কোম্পানির উন্নত জাতের দ্রুত বর্ধনশীল পোনা।

কম্পোষ্ট সার বা জৈব সারঃ গবাদি প্রাণির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদির পচনের ফলে তৈরিকৃত জৈবসার পুকুরে প্রাণিকণা তৈরিতে খুবই জরুরি।

অজৈব সারঃ এটি উদ্ভিদ কণা তৈরি করে যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি।

রেডি ফিডঃ ভালো কোম্পানির গুণগত মানসম্পন্ন খাবার।

চুনঃ পানি পরিষ্কার করা, ঘোলাটে ভাব কমানো, পিএইচ নিয়ন্ত্রণ, রোগ জীবাণু ধ্বংস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিষাক্ত গ্যাস দূরীকরণে ও শ্যাওলা ভাব কমাতে চুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঔষধঃ রোগ প্রতিরোধে ভালো কোম্পানির ঔষধ।

পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতিঃ পুকুর শুকানো ও মেরামত

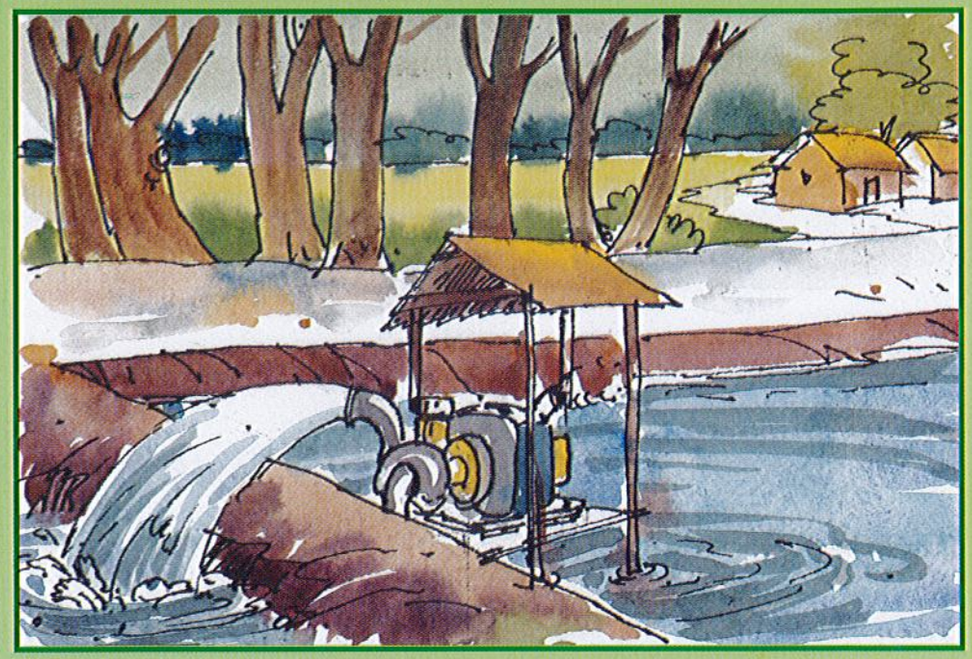

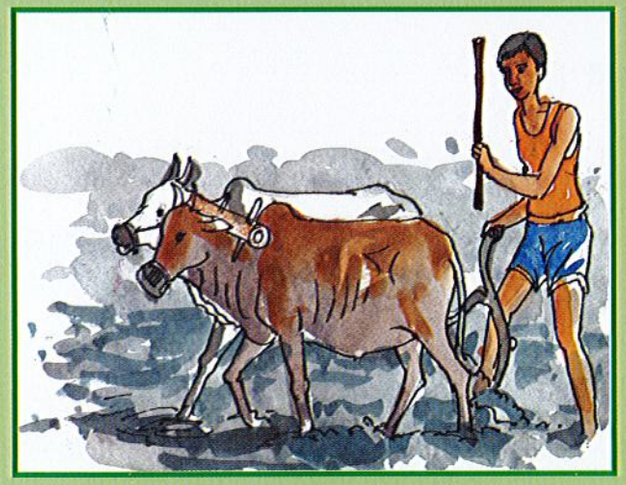

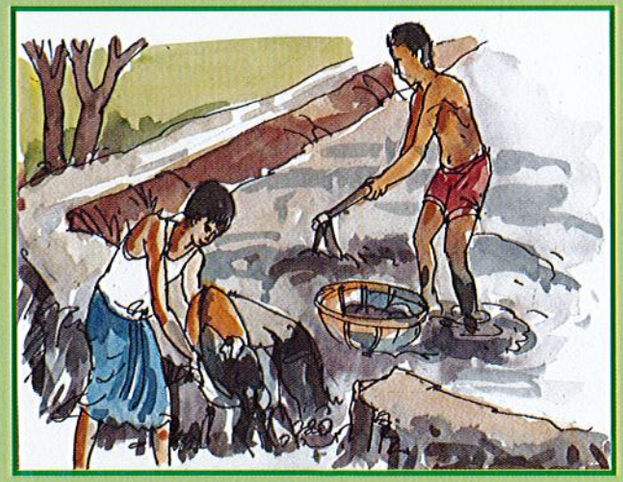

পুকুর শুকানো ও মেরামত:

কমপক্ষে ৩ বছর চাষ করা হয়েছে, কর্দমাক্ত, যেখানে পচা গ্যাসের বুদবুদ ওঠে এবং মাঝে মাঝে মাছ মারা যায় এমন ধরণের পুকুর শুকাতে হয়। পুকুর শুকানের পর (যদি সম্ভব হয়) পুকুরে চাষ দিতে হবে যাতে ক্ষতিকর গ্যাস সমূহ বের হয়। পুকুরের পাড় ভালোভাবে বাঁধতে হবে যাতে বাহিরের পানি ভিতরে ও ভিতরের পানি বাহিরে যেতে না পারে এবং পুকুরের তলা সমান করতে হবে।

পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতিঃ রাক্ষুসে মাছ অপসারণ

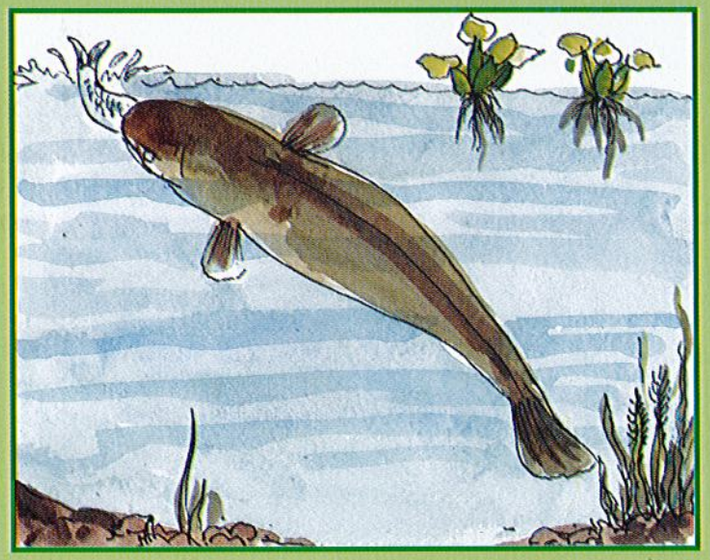

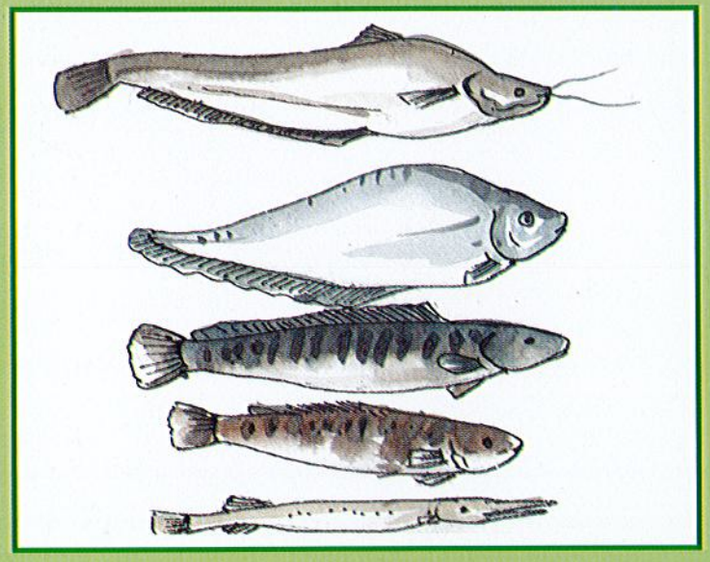

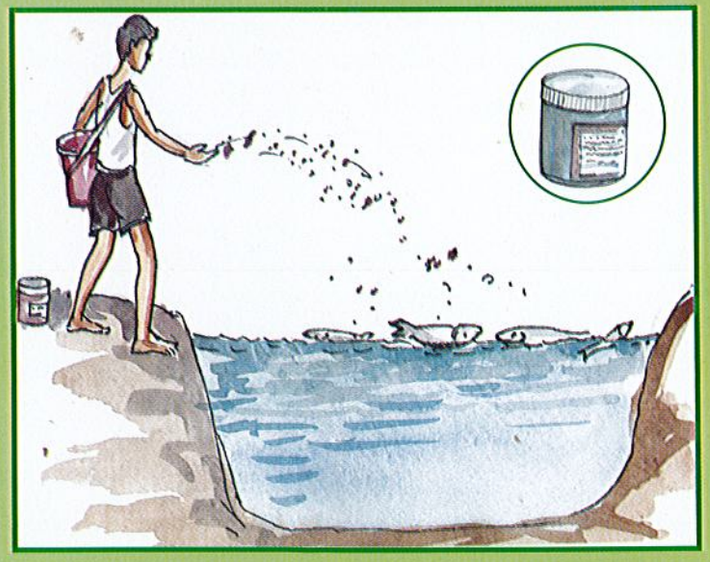

পুকুরে রাক্ষুসে মাছ অপসারণঃ

পোনা মজুদের পূর্বে পুরাতন (৩ বছরের অধিক ও পচা কর্দমাক্ত) পুকুর বা ঘের যদি সম্ভব হয় শুকাতে হবে। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি শুকানোর উপযুক্ত সময়।

যদি কোনভাবে পানি শুকানো সম্ভব না হয় তবে বার বার জাল টেনে বা পুকুরে বিষ/রোটেনন প্রয়োগের মাধ্যমে রাক্ষুসে মাছ নিধন করতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে মাছ ভাসা শুরু করে এবং এর ক্রিয়া সাধারণত ৫-৭ দিন থাকে। দুপুরে রৌদ্রজ্জল আবহাওয়ায় এটি প্রয়োগ করতে হয়।

পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: সূর্যালোক প্রবেশ, দূষণ রোধ ও এসিড-ক্ষার নিয়ন্ত্রণ

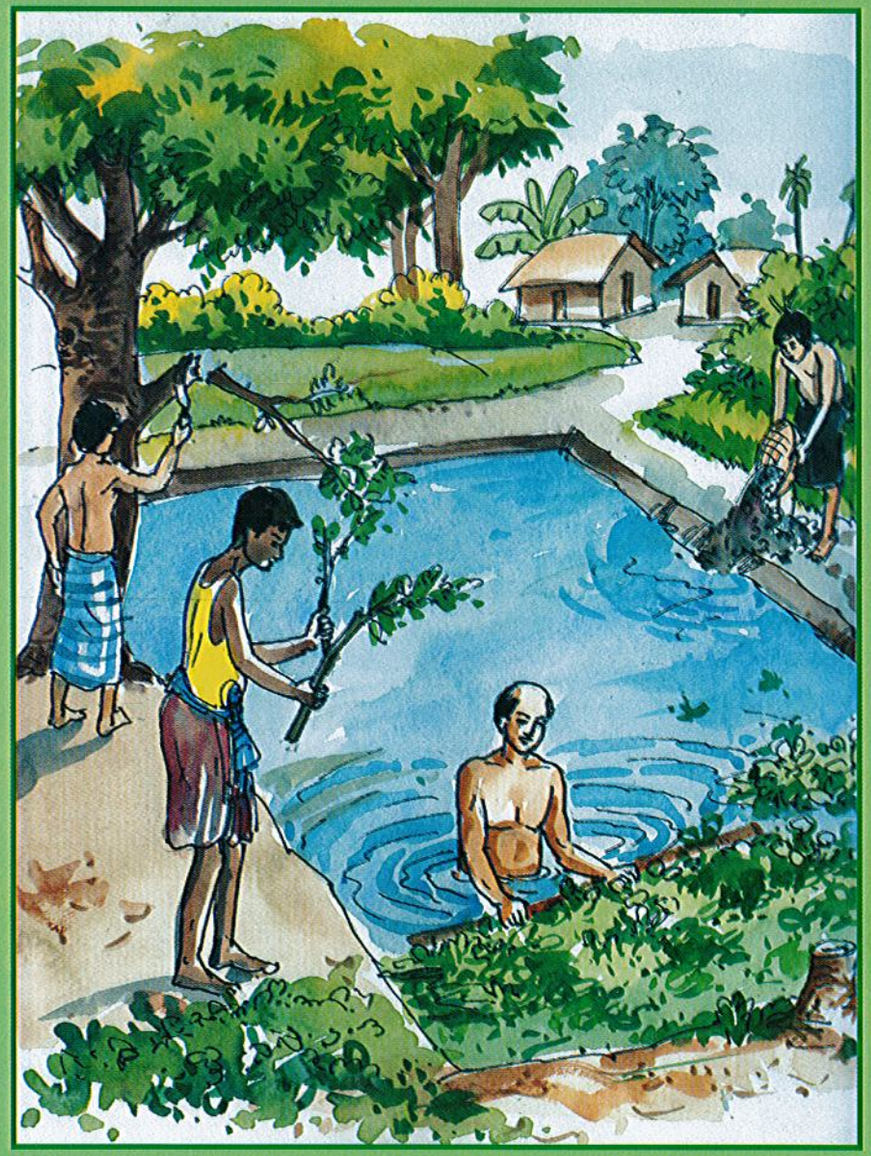

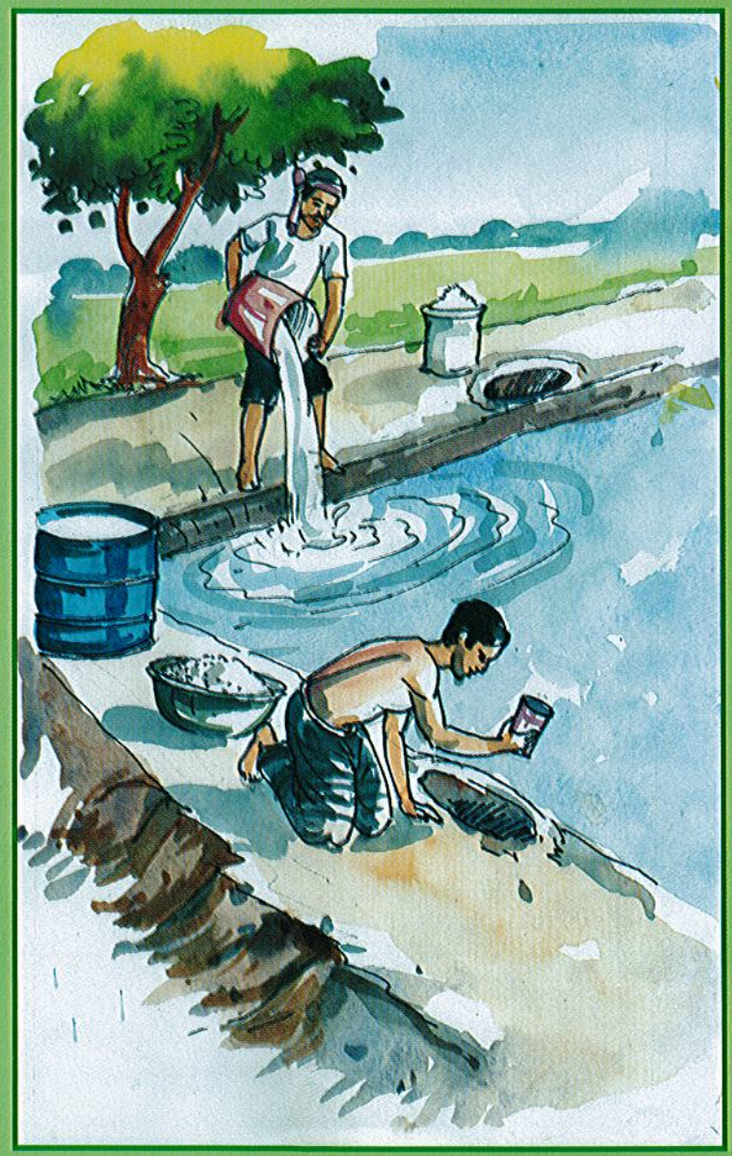

সূর্যালোক প্রবেশ, দূষণ রোধ ও এসিড-ক্ষার নিয়ন্ত্রণ:

পানিতে আলো প্রবেশ ও দূষণ রোধে পুকুরের পার্শ্বে অবস্থিত ডালপালা সমূহ কাটতে হবে। পানিতে ভাসমান, নিমজ্জিত ও মূলবেষ্টিত আগাছাসমূহ দূর করতে হবে। মাটি ও পানির স্বাভাবিক পিএইচ (pH) (৫.৫-৬.৫) রক্ষায় পিএইচ (pH) নির্ণয় সাপেক্ষে মাটিতে বা পুকুরে সঠিক মাত্রায় চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পার্শ্বে একটি গর্তে পানি ভরে অথবা মাটির বড় পাত্রে পানি ভর্তি করে পাথুরে চুন দিতে হবে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার পর পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। স্বাভাবিক চুন প্রয়োগের মাত্রা প্রতি শতকে ১ কেজি। চুন প্রয়োগের পর জমিতে ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট পরিমাণ পানি উঠাতে হবে।

চুন প্রয়োগের সতর্কতা:

চুন অবশ্যই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন আগে ব্যবহার করতে হবে এবং রৌদ্রের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা দিনে চুন প্রয়োগে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না। চুন গলাবার সময় সতর্ক থাকতে হবে ও প্রয়োগের সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে। চুন প্রয়োগের পূর্বে ৩/৪ দিন হররা টেনে নিতে হবে। চুন প্রয়োগের সময় মুখ কাপড়/গামছা দ্বারা ঢেকে নিতে হবে। মাছ থাকা অবস্থায় সকাল ৮টার আগে হলে ভাল। পুকুরের পানির এবং মাছের অবস্থা বুঝে প্রতি ৩ মাস পর পর ৫০০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন দেয়া যেতে পারে।

পোনা মজুদের জন্য পুকুর প্রস্তুতি: সার প্রয়োগ

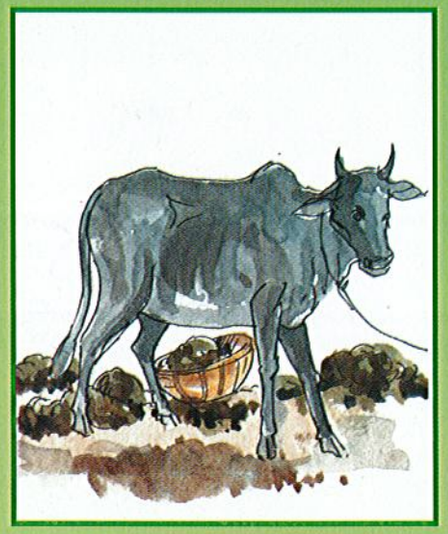

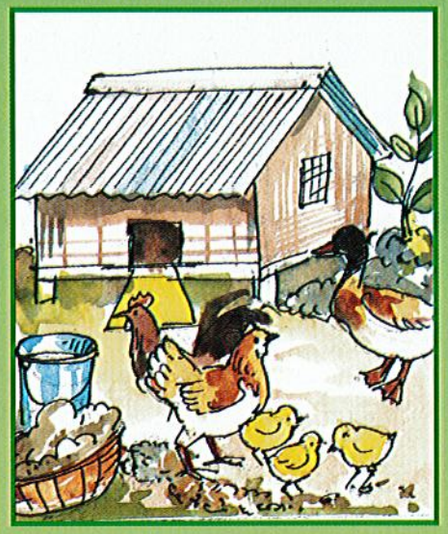

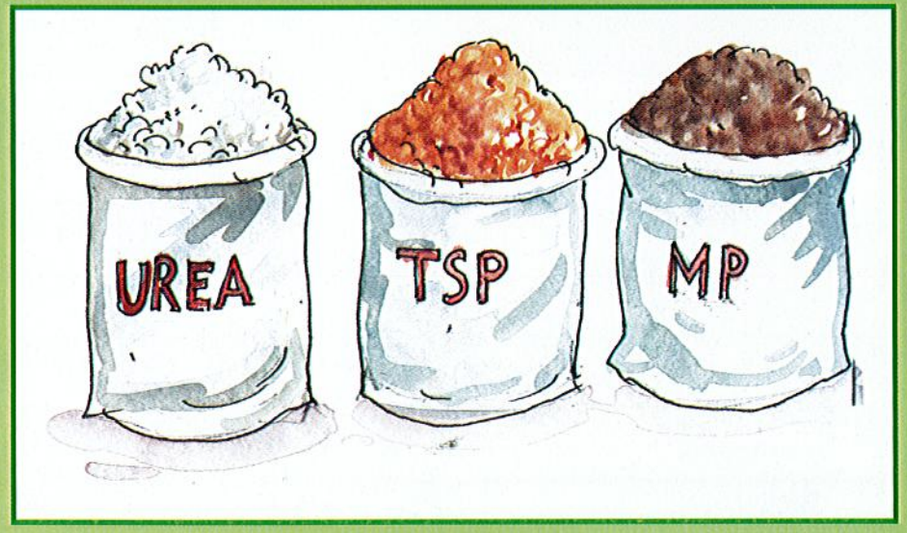

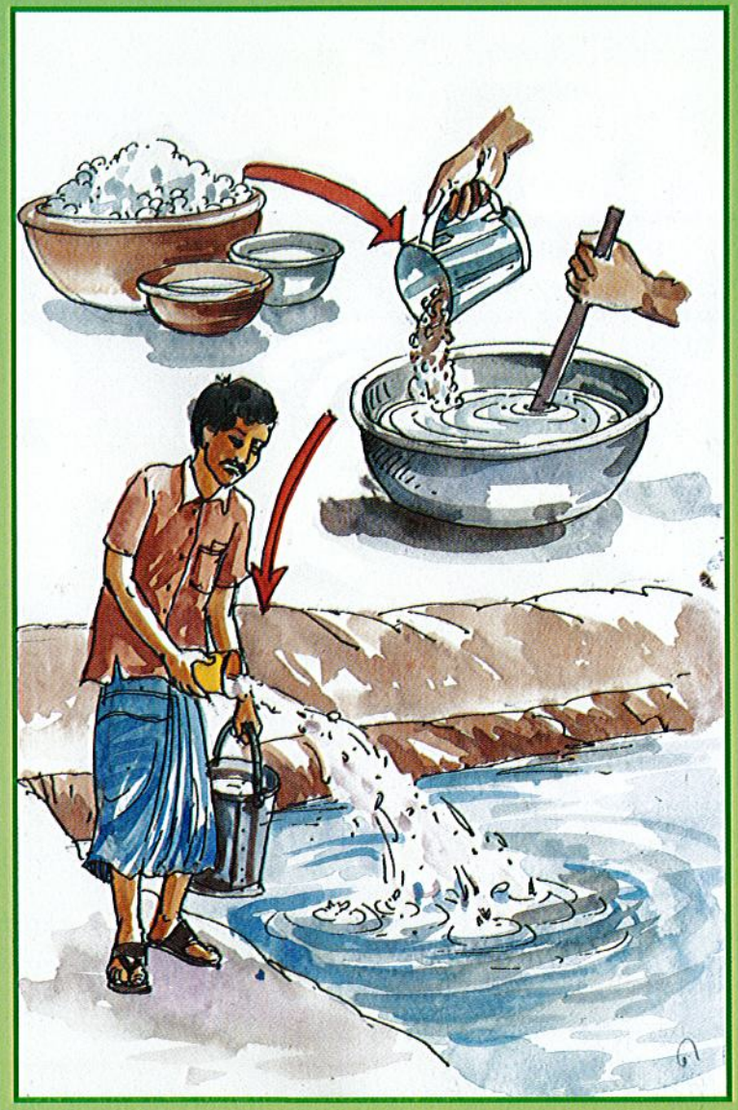

পুকুরে পানি উঠানোর পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের প্রয়োগ মাত্রা- **গরুর গোবর : প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি**

মুরগির বিষ্ঠা : প্রতি শতকে ৩-৫ কেজি

ইউরিয়া : প্রতি শতকে ১০০-১৫০ গ্রাম

টিএসপি : প্রতি শতকে ৫০-৭৫ গ্রাম

এমপি : প্রতি শতকে ২০-৩০ গ্রাম

উপরোক্ত সার পানিতে মিশ্রিত করে উক্ত মিশ্রণ সমান আকারে পুকুরে স্প্রের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। চুন প্রয়োগের পর যদি পানির রঙ গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় তবে সার প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পোনা পরিবহন ও মজুদের জন্য পোনা নির্বাচন

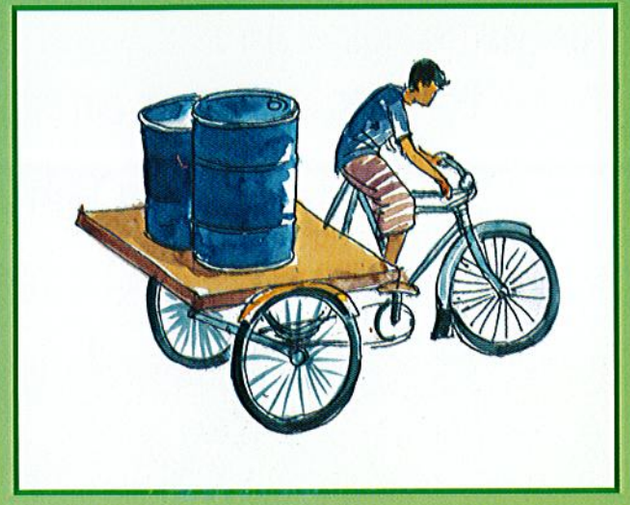

পোনা পরিবহনঃ

১. পরিবহনের কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে খাবার দেয়া বন্ধ করতে হবে। পরিবহনের ২ ঘন্টা পূর্বে হাপাতে রাখলে পেটের খাবার বের হয় ও পোনা কম মারা যায়।

২. পোনা সকালে পরিবহন করতে হয়, সূর্যালোকে কোন ক্রমেই পোনা পরিবহন করা উচিত নয়। পরিষ্কার এলুমিনিয়ামের পাত্র বা বড় ড্রামে টিউবয়েলের ঠাণ্ডা পানিতে পোনা পরিবহন করা যায় এবং মাঝে মাঝে হাত নেড়ে অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়।

৩. প্রয়োজনে পাতিলের পানি পরিবর্তন করতে হবে। হাড়িতে পরিবহনে কখনও ৪ ঘন্টার বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। ২৪ লিটার পাত্রে সাধারণত ১৫০-২০০ পোনা সরবরাহ করা যাবে।

৪. উন্নত পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমেও পোনা পরিবহন করা হয়।

ভালো পোনা নির্বাচনঃ

১. কমপক্ষে ৩-৫ ইঞ্চি, দাগমুক্ত, শরীরে লালা থাকবে ও গা পিচ্ছিল হবে, দৈহিক স্বাভাবিক আকৃতির অর্থাৎ মাথা, শরীর ও লেজের আনুপাতিক দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক দেখাবে।

২. ভালো পোনার চোখ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেখাবে এবং ফুলকা উজ্জ্বল লাল টকটকে হবে।

৩. শব্দ বা অনুভূতি থাকবে অর্থাৎ পাতিলের গায়ে টোকা দিয়ে শব্দ করলে অন্য পাশে অবস্থান নেবে।

৪. সতেজ ও গায়ে জোর থাকবে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার চেষ্টা করবে এবং লেজ ধরলে লাফিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

পোনা মজুদপূর্ব রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও খাপ খাওয়ানো

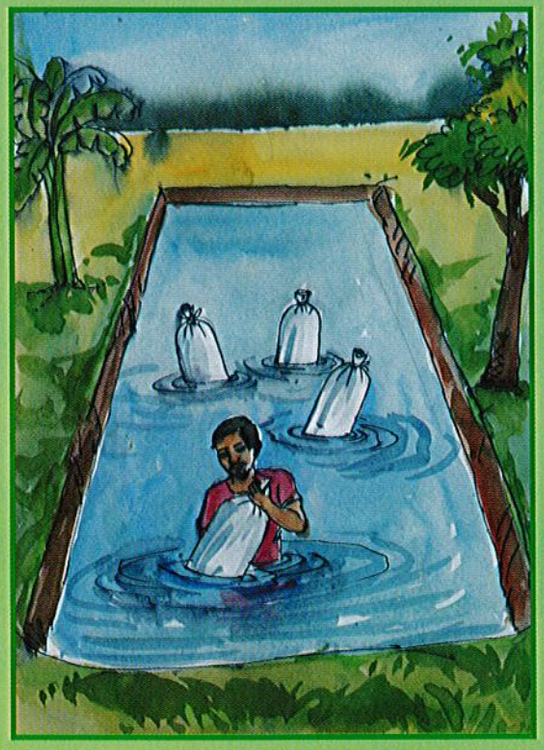

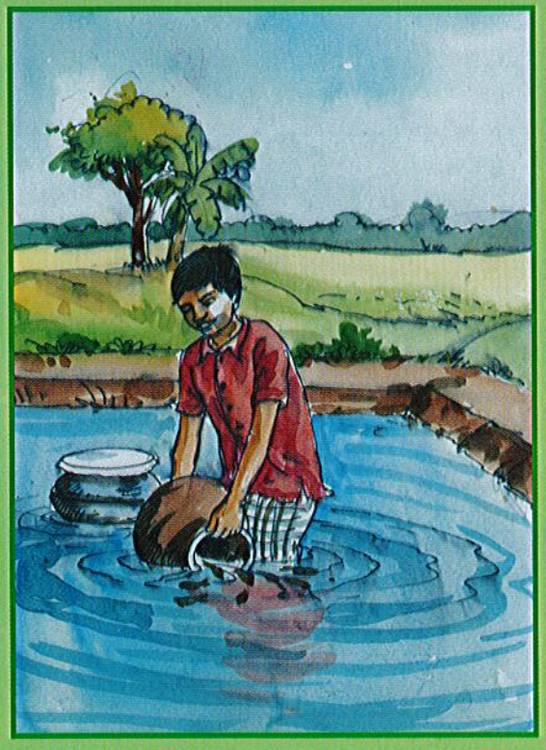

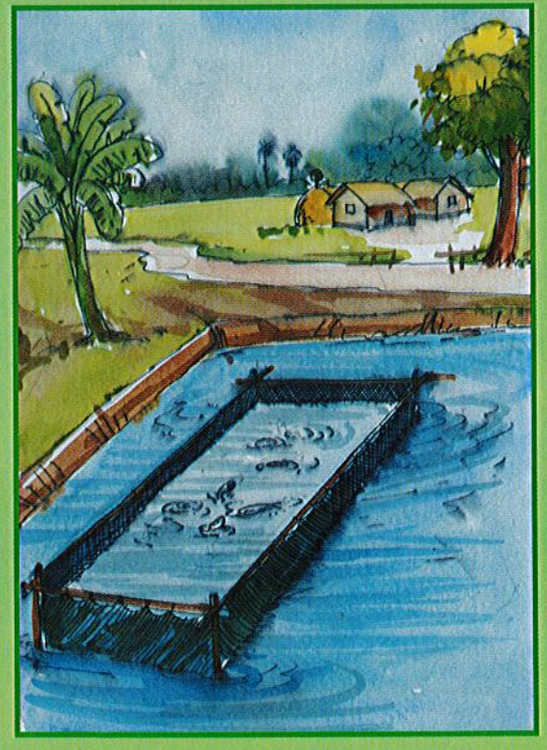

মজুদপূর্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা:

পোনার রোগ প্রতিরোধে একটি বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে সেখানে ১ চামচ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণের একটি মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। মজুদের পূর্বে মাছের পোনা উক্ত মিশ্রণে ১ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রাখলে অনেক রোগ বালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

পোনা খাপ খাওয়ানো:

পরিবহনের পর পোনার পাতিল বা পলিব্যাগ ২০-২৫ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রেখে পুকুর ও পাতিলের পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হয়। এরপর, আস্তে আস্তে হাত দিয়ে কিছু পানি পাতিল থেকে পুকুরে ও সমপরিমান পানি পুকুর থেকে পাতিলের মধ্যে পূর্ণ করলে পানিতে মাছ অভ্যস্ত হবে, তখন পাতিল পানিতে হালকা কাত করে ছোট ছোট ঢেউ দিলে পোনা নিজের ইচ্ছায় অবমুক্ত হবে। কোন ক্রমেই জোর করে বা সরাসরি পুকুরে পোনা ঢেলে দেওয়া যাবে না। পোনা ছাড়ার সময় হাপার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। পোনা আস্তে আস্তে হাপার মধ্যে অবমুক্ত করে পানির ছিটা দিতে পারলে অতি অল্প সময়ে পরিবহন জনিত ঝুঁকি হতে পোনা সুস্থ হতে পারে। পোনা ছাড়ার ৪ ঘন্টা পর পোনাকে সম্পুরক খাদ্য প্রদান করতে হবে। ঠান্ডা আবহাওয়াতে পোনা মজুদ করা ভালো। সকালে বা শেষ বিকেলে ঠান্ডা পরিবেশে পোনা মজুদ করতে হয়।

মজুদ পরবর্তী খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পানি পরীক্ষা

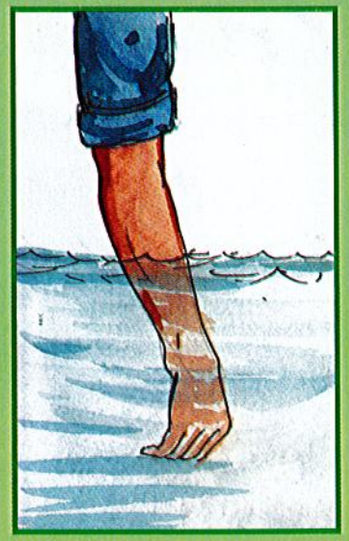

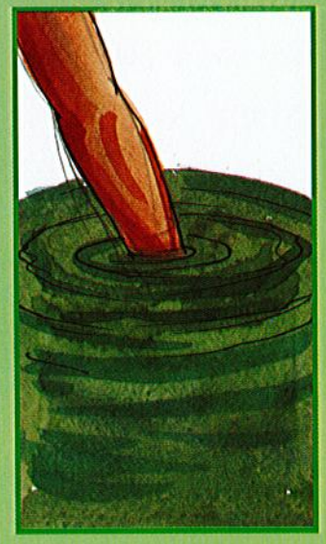

পানি পরীক্ষাঃ মাঠ পর্যায়ে দুটি উপায়ে পানি পরীক্ষা করা যায়-

প্রথম পরীক্ষাঃ একটি গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করতে হবে যদি পানির রং সবুজ অথবা বাদামী এবং এর মধ্যে যদি ছোট ছোট জীবন্ত প্রাণী চলাফেরা করে তবে পুকুরে খাদ্য উপস্থিতি বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় পরীক্ষাঃ পানির সবুজ রং মানেই পুকুরে খাদ্য বিদ্যমান। পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবালে যদি হাত স্বচ্ছ ভাবে দেখা যায় তবে পুকুরে খাদ্য খুব কম আছে, যদি হাতের কব্জি দেখা না যায় তবে ভালো খাদ্য আছে। হাতের কব্জি পর্যন্ত ডুবালে যদি হাত দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রচুর খাদ্য আছে এবং এক্ষেত্রে পানি অধিক গাঢ় রঙের হয়। এ ধরনের পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনে মাছের পোনা মারা যায়।

মজুদ পরবর্তী জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ

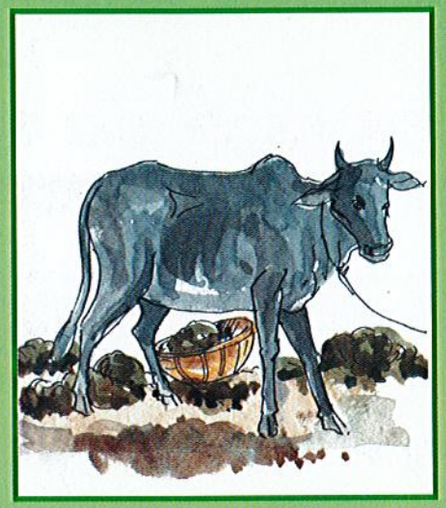

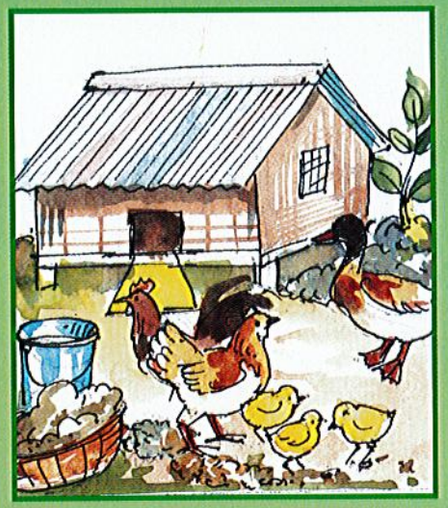

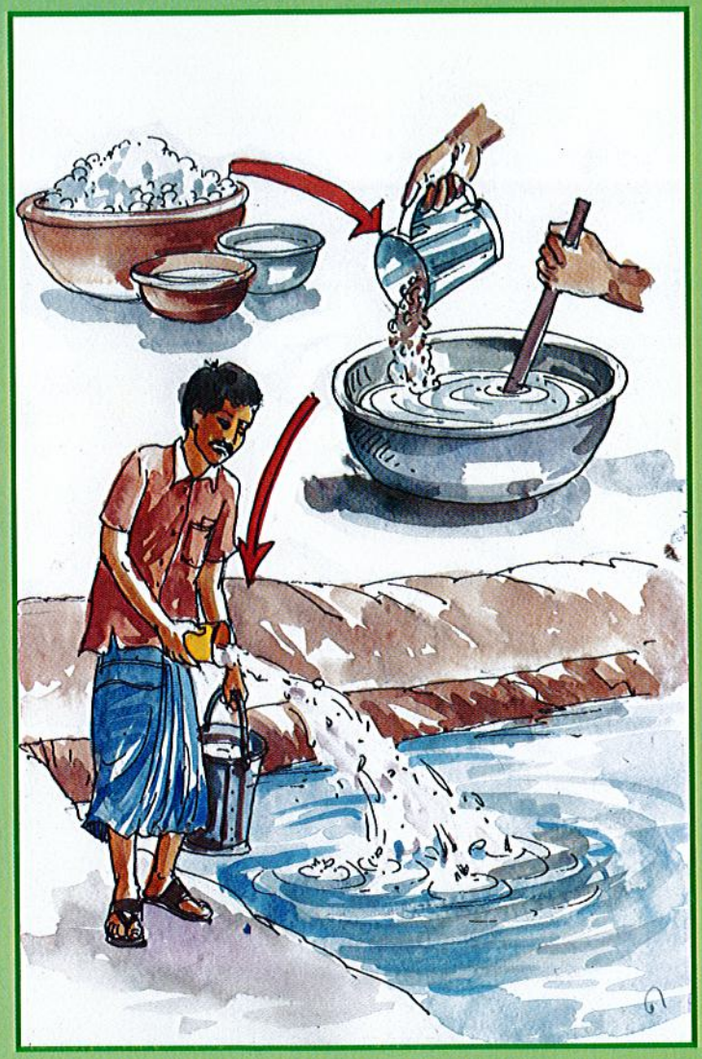

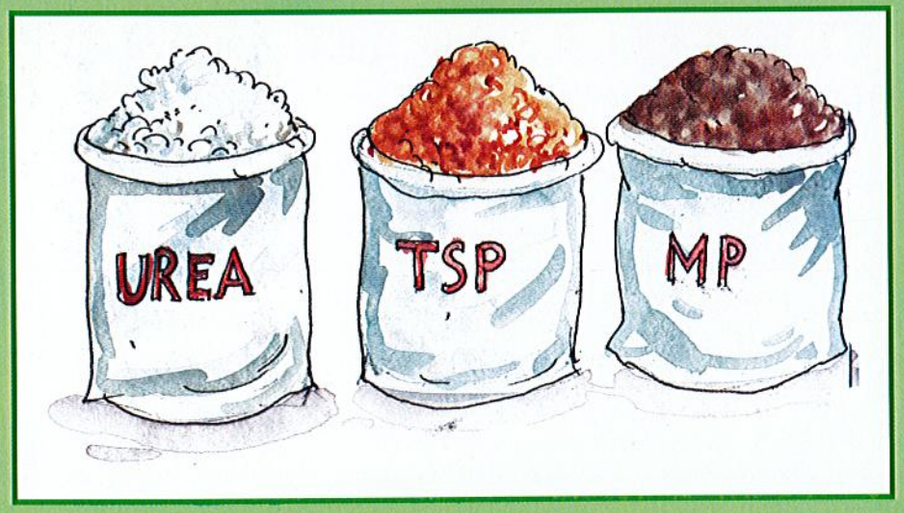

মজুদ পরবর্তী জৈব ও অজৈব সারের প্রয়োগ মাত্রা:

প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন চলমান রাখার জন্য মজুদ পরবর্তী সময়ে এটি প্রয়োজন। প্রতি শতকে প্রয়োগ মাত্রা-

সারের ধরণ	গোবর	হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	ইউরিয়া	টিএসপি
দৈনিক	৩০০-৪০০ গ্রাম	১৫০-২০০ গ্রাম	৪-৫ গ্রাম	৩-৪ গ্রাম
সাপ্তাহিক	১.৫-২.০ কেজি	১.০-১.৫ কেজি	২০-২৫ গ্রাম	১০-১৫ গ্রাম

টিএসপি সার আগের দিনে ভিজিয়ে রাখতে হবে, রৌদ্রজ্জল সকালে (১০:০০-১১:০০) উপরোক্ত সারগুলো মিশ্রিত করে ছিটিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা তুলনামূলক কম ও ধীরে পাওয়া যাবে।

সার প্রয়োগের সতর্কতাঃ

১. পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
২. রৌদ্র আলোকিত দিনে সার প্রয়োগ করতে হবে।
৩. চুন দেওয়ার ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হবে।
৪. পুকুরে মাছ খাবি খাওয়া অবস্থায় সার প্রয়োগ করা যাবে না।
৫. সারের মাত্রা সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে।
৬. শীতের সময় সার প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ রাখতে হবে।

মজুদ পরবর্তী সম্পুরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা

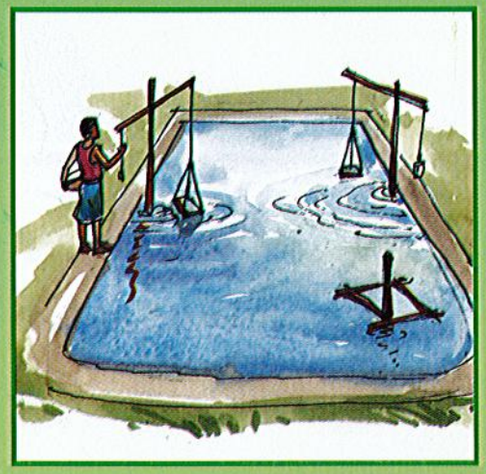

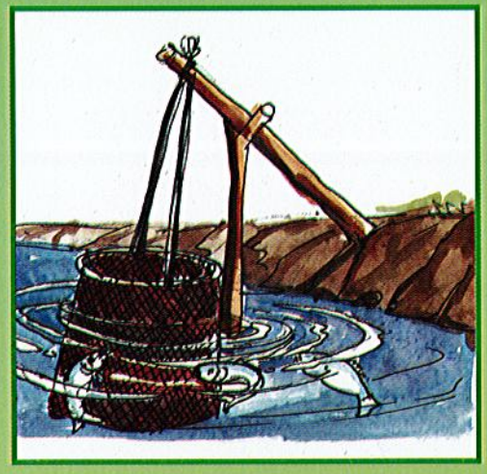

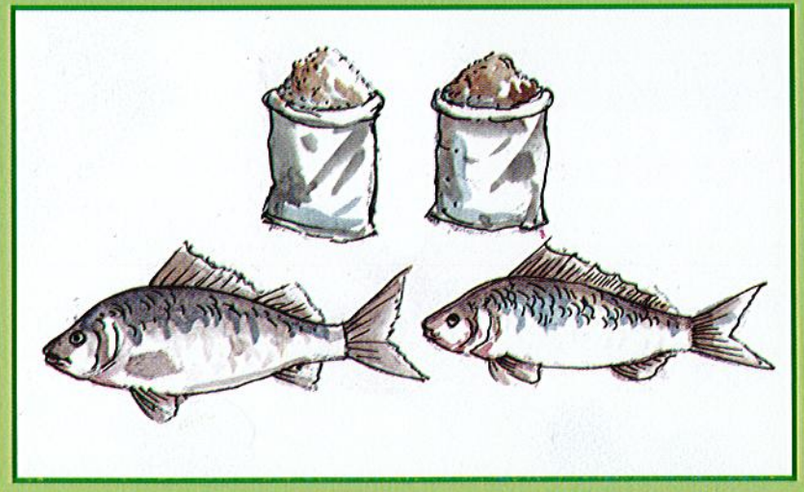

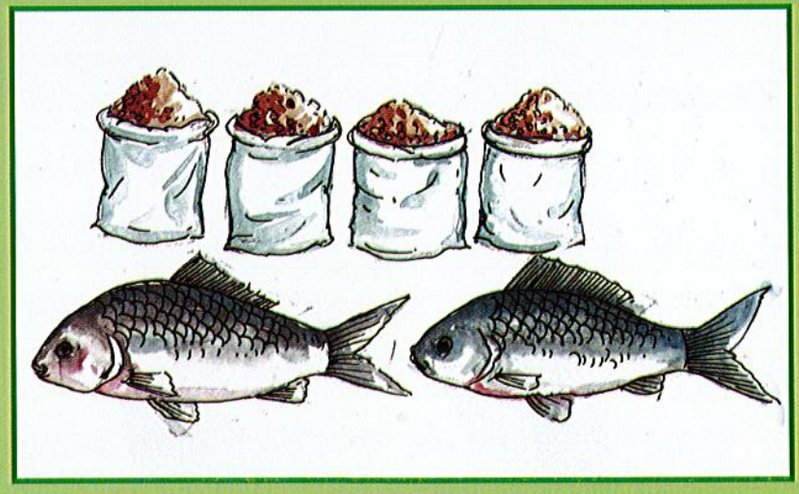

সম্পুরক খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য, নমুনায়নের মাধ্যমে পুকুরের মাছের মোট ওজনের ২% হারে খাবার প্রদান করতে হয়। ১০০ কেজি পুকুরের মাছের জন্য ১ কেজি খৈল এবং ১ কেজি গমের/ধানের ভুষি প্রদান করতে হয়। যদি রেডি ফিড হয় তবে কোম্পানীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

প্রচলিত খাবারের ক্ষেত্রে (খৈল, ভুষি ইত্যাদি), খাদ্য উপাদানসমূহ সারারাত ভিজিয়ে রেখে বল তৈরি করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা খাবার ট্রেতে খাদ্য প্রদান করতে হয়। সারাদিনের খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে সকালে দুইবার এবং বিকেলে দুইবার প্রদান করতে হয়।

সম্পুরক খাদ্য প্রদানে বিবেচ্য বিষয়ঃ

১. গরমকালে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী এবং শীতকালে তুলনামুলক ভাবে কম, বৃষ্টি বা মেঘলা দিনে কম খাদ্য দিতে হবে;

২. নির্দিষ্ট স্থান/ফিডিংট্রেতে ও নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য সরবরাহ করলে মাছের খাদ্য গ্রহণ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়;

৩. মাছের ওজন ও প্রজাতি বিবেচনা করে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়, প্রতি ১ মাস পর পর মাছের দৈহিক ওজন হিসাব করে সম্পুরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়;

৪. মাছ ভাসলে, মাছ রোগাক্রান্ত হলে বা মাছ কোন কারণে খাবার না খেলে খাবার বন্ধ রাখতে হয়;

৫. পানির গুনাগুন, তাপমাত্রা, মাছের খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বিবেচনা করে খাদ্যের পরিমাণ কম বা বেশী হবে।

মাছের নমুনায়ন

মাছের বৃদ্ধির হার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বেঁচে থাকার হার, প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদানের পরিমাণ ও মাছ আহরণ উপযোগী হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য মাসে দু-একবার জাল টেনে দেখতে হবে। তাছাড়া জাল টানলে পুকুরের তলদেশে পড়ে থাকা পাতা, ডালপালা, জমে থাকা বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর গ্যাস ইত্যাদি বের হয়ে আসে।

পুকুরের মজুদকৃত মাছের মোট সংখ্যার কমপক্ষে ৫-১০% ধরতে হবে, এটি সম্ভব না হলে কমপক্ষে ৩০-৪০ টি মাছ ধরে নমুনায়ন করতে হবে। মাছ ধরার পর দৈহিক বৃদ্ধি, শারীরিক অবস্থা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পাখনা-ফুলকা, শরীরের উপর বিজল ইত্যাদি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়াও মাছের শরীরে দাগ বা শরীরে পরজীবি আছে কি না তাও ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

এরপর প্রত্যেক প্রজাতির/জাতের মাছের গড় ওজনকে ঐ প্রজাতির মোট মজুদকৃত মাছের সংখ্যা দ্বারা গুণ করে কোন একক প্রজাতির ওজন পাওয়া যাবে। একইভাবে অন্যান্য প্রজাতির ওজন বের করে একত্রে যোগ করলেই ঐ পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট ওজন জানা যাবে।

সাপ্তাহিক ও মাসিক কাজ

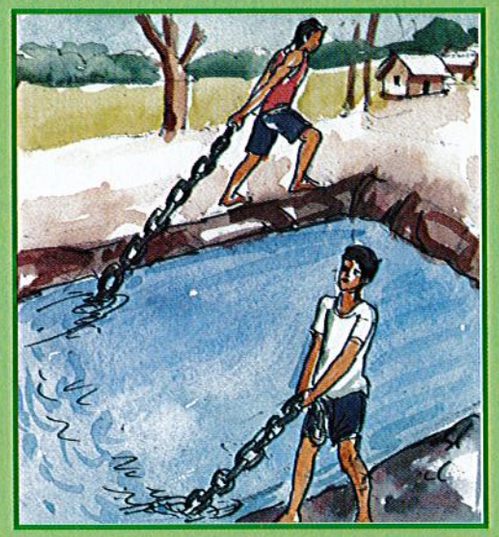

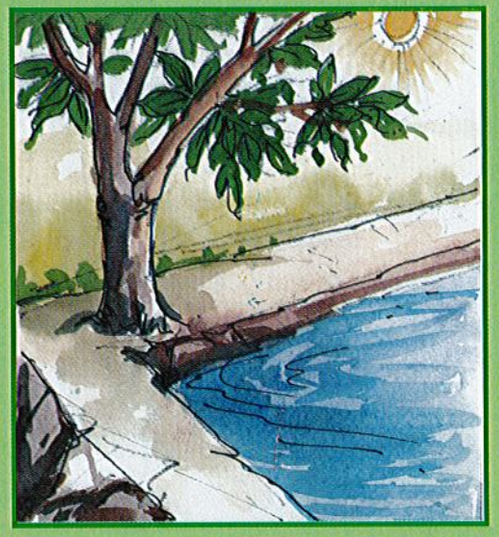

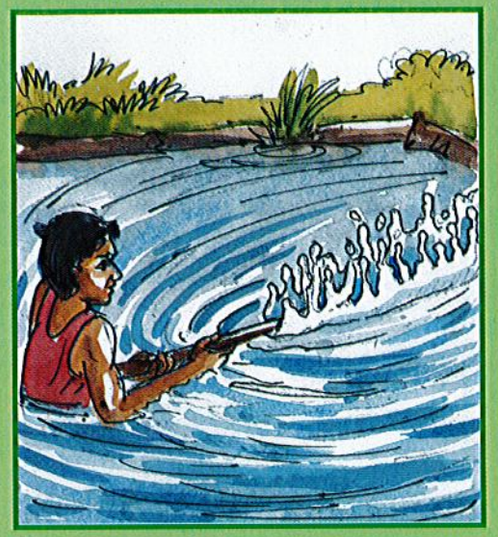

প্রতি সপ্তাহে পুকুরে আঁচরা দিতে হবে, একটি চেইন অথবা বাঁশের আঁচরায় ইট/পাথর বেঁধে ২-৩ বার টানতে হবে। এতে পুকুরের এমোনিয়া গ্যাস দূর হবে এবং পুষ্টিকণাসমূহ মুক্ত হবে।

পুকুরের পানিতে আলো প্রবেশ এবং পুকুরের পানি গাছের পাতামুক্ত রাখতে গাছের অবাঞ্চিত ডালপালা নিয়মিত কাটতে হবে।

মাসে কমপক্ষে একবার জাল টেনে মাছ ধরে গড় ওজন পরীক্ষা করতে হবে। মাছের আকৃতি এবং সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা চিহ্নিত করতে হবে। রোগাক্রান্ত মাছ পুকুরে পুনরায় ছাড়া যাবে না।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

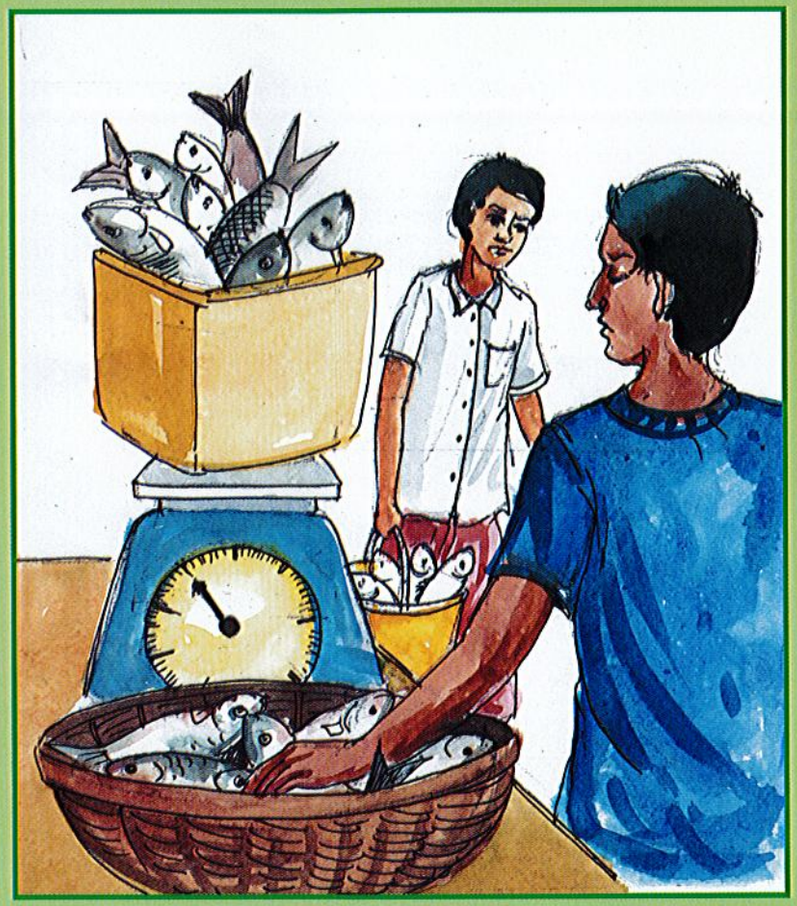

মাছ আহরণের সময়ঃ

ভালো দাম পেতে নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরতে হবে এবং বাজারের নির্দিষ্ট সময়ে আড়তে নিতে হবে।

বিক্রয়ঃ

জীবিত মাছ বাজারে বিক্রি করা। মাছ বিক্রয়ের পূর্বে আড়তে খোঁজ নিতে হবে এবং বেশি পরিমাণে মাছ ধরলে অধিক লাভের জন্য ২-৩ টি বাজারে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাজারে চাহিদা কম থাকলে বেশী পরিমাণ মাছ না ধরাই উত্তম।

গ্রেডিং ও পরিবহন ব্যবস্থাপনাঃ

১. ধৌত করা, ময়লা আর্বজনা পরিষ্কার এবং মাছের সাইজ ও প্রজাতি অনুযায়ী আলাদা করা;
২. শক্ত ও বড় আকারের মাছ (মৃগেল, রুই, কাতলা) পাত্রের নিচের দিকে ও ছোট এবং নরম মাছ সিলভার, পুটি, গ্রাস কার্প উপর দিকে রাখা;
৩. পলিথিন বা বস্তায় না ভর্তি করা, কলপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা ও মাঝে মাঝে মাছে পানি ছিটা দেওয়া;
৪. দূরে পরিবহনের জন্য কর্ক শিটের বক্সে বরফ দিয়ে মাছ রাখা অথবা দুই পরত বিশিষ্ট হোগলা পাটির ডোল বা খাঁচায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহন করা।

মাছ ধৌতকরণ ও গ্রেডিং এর সুবিধা:

১. মাছের রং উজ্জ্বল হয় ফলে চাহিদা বাড়ে ও ভালো দাম পাওয়া যায়;
২. ক্রেতা আকর্ষণে সুবিধা হয়;
৩. মাছ পচন থেকে রক্ষা করা যায়;

মাছের সাধারণ রোগবালাই: মাছের ক্ষত রোগ ও পাখনা/লেজ পচা রোগ

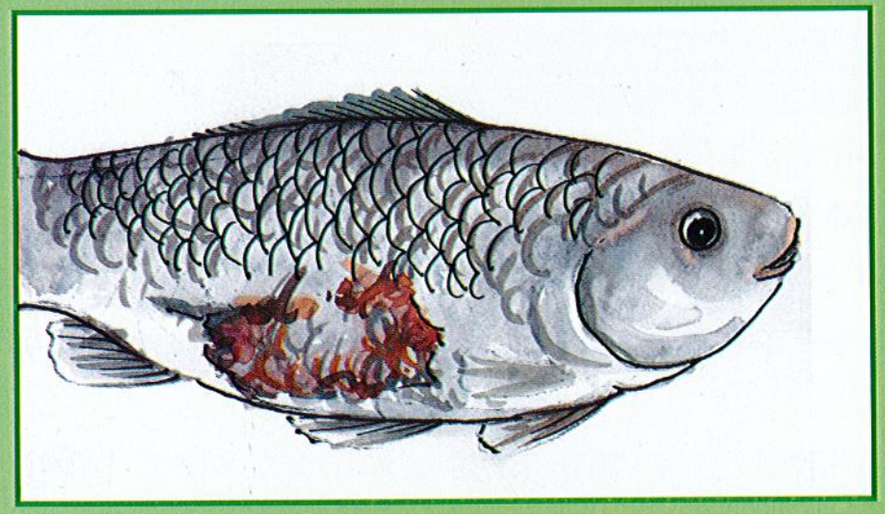

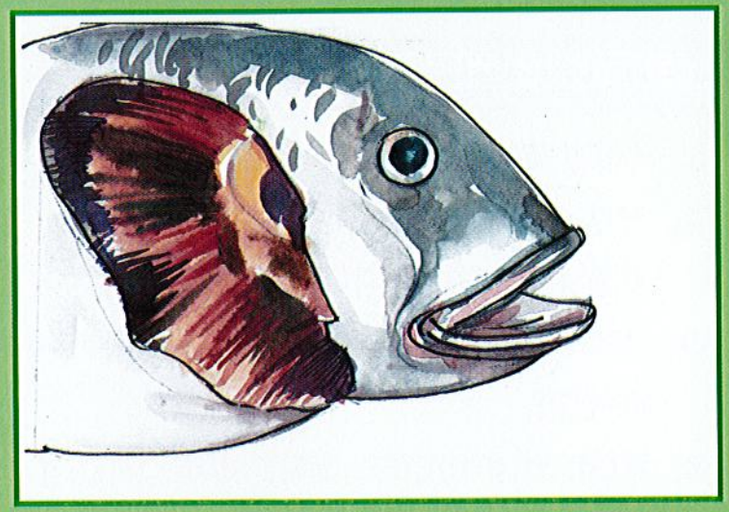

মাছের ক্ষত রোগঃ

শৈল, গজার, টাকি, পুঁটি, বাইন, কৈ, মৃগেল ও কার্প ইত্যাদি প্রজাতির মাছ আক্রান্ত হয়ে থাকে। লেজের গোড়া, পিঠ ও মুখের দিকে ক্ষত দেখা যায় এবং এটি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘায়ের স্থানে চাপ দিলে কখনো কখনো পুঁজ বের হয়। রোগাক্রান্ত মাছ পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তুলে ফেলতে হবে। ১০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ গুলে লবণ মিশ্রিত পানিতে রোগাক্রান্ত মাছ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন ও ১ কেজি হারে লবণ প্রয়োগ করা হলে শীত মৌসুমে ক্ষত রোগ থেকে মাছ মুক্ত থাকে।

পাখনা/লেজ পচা রোগঃ

রুই জাতীয়, শিং-মাগুর ও পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছ আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক ভাবে পিঠের পাখনা এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পাখনাও আক্রান্ত হয়। পুকুরে সাময়িকভাবে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়া রোগ-জীবাণু ধ্বংসের পর মজুদকৃত মাছের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হবে। ০.৫ পিপিএম পটাশযুক্ত পানিতে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করা অতি জরুরি।

মাছের সাধারণ রোগবালাই: মাছের উকুন, পেট ফোলা ও অপুষ্টিজনিত রোগ

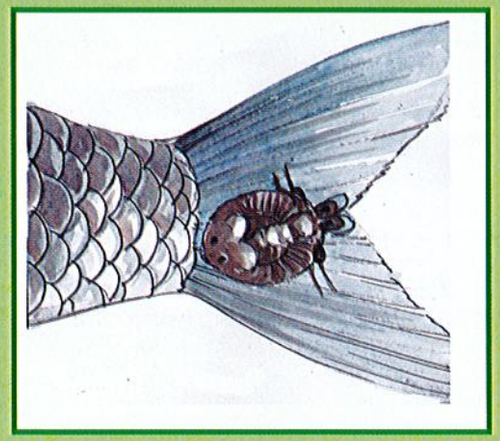

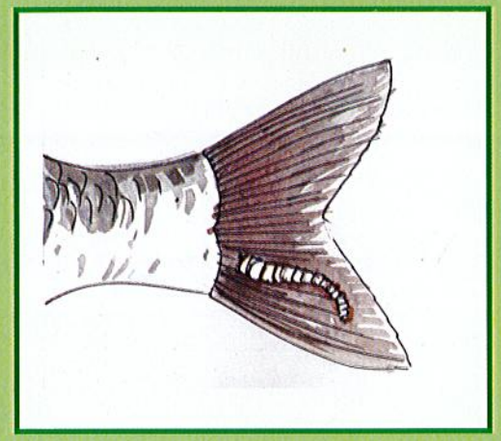

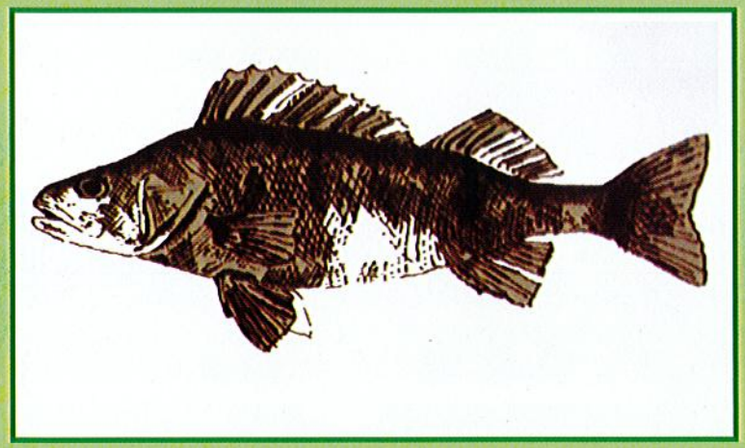

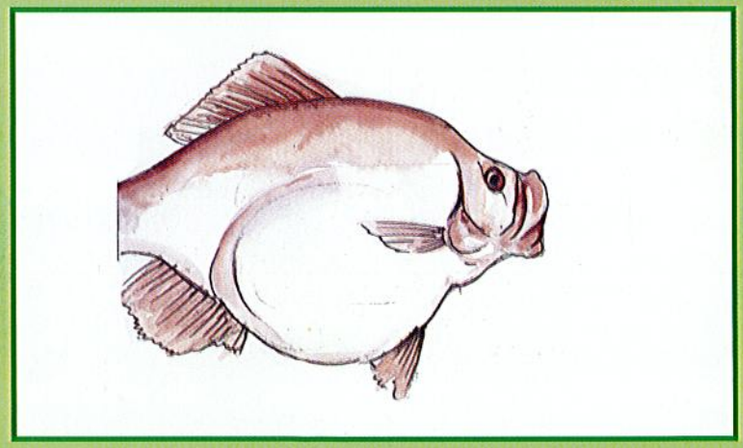

মাছের উকুনঃ

রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ রোগে মাছের সারা দেহে উকুন ছড়িয়ে দেহের রস শোষণ করে মাছকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। এতে মাছ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে মারা যায়। শতকরা আড়াই ভাগ লবণ দ্রবণে কিছু সময় আক্রান্ত মাছ ডুবিয়ে রাখলে উকুনগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়বে। এমতবস্থায় হাত কিংবা চিমটা দিয়ে উকুনগুলো মাছের শরীর থেকে তুলে ফেলতে হবে।

মাছের পেট ফোলা রোগঃ

রুই জাতীয়, শিং-মাগুর ও পাঙ্গাস মাছ আক্রান্ত হয়। এ রোগে মাছের দেহের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পেটে পানি জমার কারণে পেট ফুলে যায়, মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করে, বেশিরভাগ সময়ই পানির ওপর ভেসে ওঠে এবং খাবি খায়। আক্রান্ত মাছ অতি দ্রুত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সিরিঞ্জ দিয়ে পেটের পানি বের করে ২৫ মিলিগ্রাম/কেজি হারে ক্লোরেমফেনিকল ইনজেকশন অথবা ২০০ মিলিগ্রাম ক্লোরেমফেনিকল পাউডার/কেজি সম্পুরক খাবারের সাথে মিশিয়ে প্রদান। শতাংশে ১ কেজি হারে চুন ও ফিসমিল ব্যবহারে এ রোগ প্রতিরোধে করা যায়।

অপুষ্টিজনিত রোগঃ

পুকুরে চাষ যোগ্য যে কোন মাছই আক্রান্ত হতে পারে। ভিটামিন এ,ডি এবং কে এর অভাবে মাছের অন্ধত্ব এবং হাড় বাঁকা রোগ হয়। মাছের খাবারের আমিষের ঘাটতি দেখা দিলেও স্বাভাবিক বর্ধণপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় ও মাছ নানা রোগের কবলে পড়ে। এসব রোগে আক্রান্ত মাছকে খাবারের

ARANNAYK
FOUNDATION

Conserving forests for the future

যোগাযোগঃ
আরণ্যক ফাউন্ডেশন